# আঞ্চলিক ইতিহাসে লোকসংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা

সুধীর চক্রবর্তী

আপনাদের কাছে জানানোর কথা এইটাই, যে বিষয়টি নিয়ে বলবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছি বলা যায়, যে বিষয়ে আমার বলার কথা, সেই বিষয়ে আমার পুঁথিগত বিদ্যে খুব কম। কিন্তু সরেজমিন অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। আমার বক্তৃতাটা প্রায় সেইদিক দিয়েই যাবে।

আমি একজন পায়ে হাঁটা গবেষক। আপনারা শুনলে অবাক হবেন আমি সাইকেলটাও চড়তে পারি না। তাই প্রকৃত অর্থে পায়ে হেঁটে গ্রামে ঘুরেছি। আধুনিক কোনো যানের মতো আধুনিক প্রযুক্তিও আমার সঙ্গে থাকে না। একটা টেপ রেকর্ডার বা ক্যামেরাও আমার কাছে থাকত না। আমার এইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এইগুলো থাকলে পরে প্রতিবন্ধকতা আসে। যদি দেখতে পায় আমার কাছে একটা টেপ রেকর্ডার আছে, কেউ অর্ধেক কথা বলবে না। আমার পদ্ধতি ছিল তাদের মধ্যে ঢুকে যাওয়া। তাদের সঙ্গে বসবাস করা। একসঙ্গে খাওয়া ও তাদের তৈরি করা বিছানাতে শুয়ে পড়া। যেটা সভ্য সমাজের জন্য খুব অনুকূল নয়। তাদের সঙ্গে গান গাওয়া। মেলায় গিয়ে রাত্রি যাপন। সেদিক থেকে আমার মনে হয়, আমার যেটুকু ভিতরকার এই বলবার শক্তি, এই মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া। জ্ঞানবিদ্যার মধ্যে দিয়ে এইটা পাওয়া নয়। আমি আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার বিষয়ে আপনাদের কাছে তাত্ত্বিকভাবে কিছু বলবো না। হিস্ট্রিওগ্রাফি নিয়ে আজকাল অনেক চর্চা হচ্ছে, ঐতিহাসিকরা অনেক নতুন তথ্যের আমদানি করেছেন। যার ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাব অলর্টান তত্ত্ব। ইংরেজিতে বলা হয়— History from the bellow। বিদেশে একটা বিখ্যাত গল্প আছে— প্রদর্শনীতে দেখা যাচ্ছে, মৃত বাঘের উপর এক গোঁফওয়ালা শিকারি দৃপ্তভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। সেটা সবাই দেখে বাহা্ বাহা্ করছে, আর আচমকা একটা জ্যান্ত বাঘও সেই প্রদর্শনীতে ঢুকে পড়ছে। সে ওই ছবিটা দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। তখন সাংবাদিকরা তাকে জিগ্যেস করে, এত হাসার কী আছে? বাঘ উত্তর দেয়, আসলে মানুষ এঁকেছে তো, আমি আঁকলে ছবিটা হতো এইরকম : বাঘের মুখের ভেতর মানুষ ছটফট করছে। এইটে হচ্ছে সাব অলর্টান তত্ত্ব। তেমনই তাজমহল নিয়ে আমরা এত হইচই করি, তাজমহল তৈরি করেছে কারা? খুব সাধারণ মানুষ। কই তাদের কথা তো কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ল, কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা আসার সময়, ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর বিরহী বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে যে পেট্রল পাম্প আছে তার সিমেন্টের উপর অনেক লোকের হাতের ছাপ। তলায় লিখে দেওয়া রয়েছে, এইগুলো সেইসব লোকদের হাতের ছাপ, যারা এই পেট্রল পাম্পটা তৈরি করেছে। আমি সারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে কোথাও শ্রমিকদের এই স্বীকৃতি দেখিনি। ওই সাধারণ মানুষ, যারা তৈরি করেছে— সেই কারিগরদের হাতের ছাপ ওই সিমেন্টে চিরন্তন হয়ে গেছে। লোকজন আসে তেল ভরে চলে যায়। আমি জিগ্যেস করেছি, কেউ সেদিকে তাকায় না। সুতরাং আঞ্চলিক সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আমাদের অহমিকা, অহংকার আর নাগরিকতা নিয়ে এগিয়ে চলে যাচ্ছি গাড়ি করে, কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই এইরকম কিছু কিছু জিনিস রয়ে গেছে।

আমি যখন গবেষণা করতে যাই মেহেরপুরে, এখন ভাগ হয়ে বাংলাদেশে পড়েছে—তখন ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। অগম্য জায়গা। পাসপোর্ট নিয়ে যাওয়া যায় না। আর আমার পাসপোর্ট ছিলও না। তবুও আমি সেখানে গেছি। মেহেরপুরে একজন লোক জন্মেছিলেন, তাঁর নাম বলরামচন্দ্র হাড়ি।

তিনি বড় অদ্ভুত লোক। ভালো তীরন্দাজ। গ্রামের জমিদার বাড়িতে কৃষ্ণবিগ্রহ ছিল, তাই তার দারোয়ান হিসেবে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু একদিন বিগ্রহের সব অলঙ্কার চুরি হয়ে গেল। তখন জমিদার ভাবলেন, যাকে আমরা দারোয়ান হিসেবে রেখেছি, সেই চুরি করেছে। গাছে বেঁধে প্রহার করা হলো। প্রহৃত হয়ে তিনি গ্রাম থেকে চলে গেলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে লিখেছেন, দীর্ঘদিন বাদে জটাজুটধারী হয়ে, বলরামচন্দ্র মেহেরপুর গ্রামে আবার ফিরে এলেন। নিজের বাড়িতেই উঠলেন। তারপর একদিন মেহেরপুর সংলগ্ন যে নদী, সেখানে ব্রাহ্মণরা তর্পণ করছেন। বলরামচন্দ্রও তর্পণ করছেন। ব্রাহ্মণরা বলেন, কি রে বলা তুই আবার কাকে জল দিচ্ছিস? আপনারা কাকে জল দিচ্ছেন? আমরা পূর্বপুরুষকে জল দিচ্ছি। বলরামচন্দ্র তখন বলেন, আমি শাকের ক্ষেতে জল দিচ্ছি। আপনাদের জলটা যদি পূর্বপুরুষের কাছে যায় তাহলে আমার জলটা শাকের ক্ষেতে যাচ্ছে।

এই যে প্রতিবাদী চেতনা, আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা করতে গেলে এই মানুষটাকে ধরতে হবে। এই মানুষটাকে ঘিরে বলাহাড়ি সম্প্রদায় বলে একটা সম্প্রদায় তৈরি হয়ে গেল। সেই গ্রামের লোকেরা ব্যাখ্যা করল আমার কাছে, 'হাড়ি' মানে ভাববেন না কোনও নিচু জাত। 'হাড়ি' হচ্ছে যে হাড় তৈরি করেছে। হাড়ের গাঁথুনি চামের ছাউনি। যিনি এই হাড় বানিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন হাড়ি। বলরাম হচ্ছেন সবচেয়ে বড় মানুষ। এইভাবে তারা একটি বিকল্প ইতিহাস তৈরি করল — ওই যে হৈমবতী—যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আর এই হৈমবতীর স্রষ্টা হলেন বলরাম।

তাঁদের মধ্যে থেকে আমি যেটা আবিষ্কার করলাম, বলরামচন্দ্রের প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে হৈমবতী আর হৈমবতী থেকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি। অজস্র বংশধারা ও ইতিহাস—এর ভেতর থেকে বলরাম কৌশলে বুঝিয়ে দিলেন, আপনাদের যে কৌলীন্য তার ভিত্তিতে কিন্তু বলরামচন্দ্র হাড়ি। এই একটা দৃপ্ত প্রতিবাদী ইতিহাস রচনার চেষ্টা আমি লক্ষ্য করলাম তাদের ভেতর। তারা আমাকে বলল, কোনো মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনে আপনাকে আমরা দেবো না। ওরা যে গুড় তৈরি করে তাই দিয়ে, সঙ্গে এক ঘটি জল দিল। বলরামচন্দ্রকে তারা যে মন্ত্র বলে প্রসাদ নিবেদন করছে, সবই বাংলায় লেখা মন্ত্র। তখন যখন লৌকিক বাংলার ভেতর ঘুরছি সেখানে নানারকম সংস্কৃত মন্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখেছি, কিন্তু বলরামচন্দ্রকে পরিষ্কার বাংলায় বলা হচ্ছে—বলরামচন্দ্র তোমাকে চাল-জল দিলাম। তুমি শান্ত হও। তুমি তৃপ্ত হও। ঠিক এই ভাষায়। এরা গান গায় পরিষ্কার ভাষায়। তাতে কোনও তত্ত্ব নেই। বলরামচন্দ্রের নিয়ম হচ্ছে তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও ব্রাহ্মণ থাকবে না। কোনোও পৈতে থাকবে না। থাকবে না কোনো উচ্চবর্ণের মানুষ। সমস্ত ভিন্নবর্গের মানুষ নিয়ে তৈরি করেছিলেন তাঁর দল। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে—'বৃষ্টি নেশা ভরা সন্ধেবেলা কোন বলরামের আমি চেলা'—কুষ্টিয়াতে রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারের কাজে থাকতেন, ওই বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষদের চাক্ষুষ দেখেছিলেন। একদিন বলরাম বসে আছেন, এক শিষ্য এসে বলল—আমি বিচার চাইতে এসেছি। কিসের বিচার? আমি জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম , তারা বলল প্রণাম কর। আমি বললাম, আমি তো বলরামচন্দ্র ছাড়া কাউকে প্রণাম করি না। তখন আমাকে সবাই মারতে লাগল। মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে, রক্তাক্ত অবস্থায় আমাকে ছেড়ে দিল। আমি মার খেয়ে আপনার কাছে এসেছি। কী করণীয় ছিল আমার? বলরামচন্দ্র বললেন, তোমাকে যদি বাঘ আক্রমণ করত—তুমি কি আমার কাছে বিচার চাইতে? ওই মানুষটাকে তুমি বাঘের মতোই মনে করতে পারতে। এই যে একটা প্রতিবাদী জাতি তৈরি হলো, একটা প্রতিবাদী চেতনা ও সম্পূর্ণ সম্প্রদায় উঠে এল। এদের নিয়ে, একটা গোটা বই আমি লিখেছি : 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় ও তাদের গান'।

এই গানগুলি আমিই প্রথম সংগ্রহ করলাম। কেউ তাদের নিয়ে আগে ভাবেনি। ১৮৭২ সালে

অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বই যখন বেরিয়েছিল, বলরামচন্দ্র সম্পর্কে খুব ছোট একটা প্রসঙ্গ ছিল, তাতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে এত তথ্য পাওয়া গেল যে একটা বই হয়ে গেল। বইয়ের মধ্যে সংগৃহীত যতগুলি গান, সবগুলি আমি তাদের কাছ থেকে মৌখিকভাবে সংগ্রহ করেছি। তার কোনো স্বরলিপি নেই। খাতাও নেই। আমার তাদের কথা আজও মনে আছে। বিপ্রদাস ও পূর্ণদাস দুজন মালো সম্প্রদায়ের মানুষ। খোঁজ করতে করতে আমি বিপ্রদাসের বাড়িতে গেলাম। জায়গাটার নাম নিশ্চিন্তিপুর। তেহট্টে নামলাম। বিডিও অফিসে গিয়ে, বিডিও সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললাম যে আমি নিশ্চিন্তিপুর যাব। কোন রাস্তা দিয়ে যাব? তাঁরা বললেন, একদম যাবেন না। ডাকাতদের গ্রাম। আমি বললাম, তাহলে তো যেতেই হয়। বাসে উঠলাম। একটা জায়গায় নামিয়ে দিয়ে বলল, এখান থেকে দু-কিমি হেঁটে গেলে নিশ্চিন্তিপুর। আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল বিপ্রদাস হালদার বলে একটা লোক আছে, সেই বলরামের সব গান জানে। তাঁর বাড়ি গিয়ে বললাম : বিপ্রদাস বাড়ি আছেন? তাঁর মেয়ে বেরিয়ে এসে বলল, তিনি বাড়ি নেই। পলাশিপাড়ার হাটে মাছ বিক্রি করতে গেছেন। নদী পেরিয়ে আমি পলাশিপাড়ার হাটে চলে এলাম। বিপ্রদাস বলল, ও আপনি এসে গেছেন। এক কাজ করুন, আপনি আমার বাড়িতে ফিরে যান। ওখানে দাওয়ায় বসে আপনার সঙ্গে কথা হবে। আপনি যান। আমি আসছি। আমি দেখলাম বিপ্রদাসের মাছ তখনও বিক্রি হয়নি। আমি নৌকো করে নদী পেরিয়ে এসে আশ্চর্য হয়ে দেখি, বিপ্রদাস বাড়িতে বসে আছে। আমি বললাম, আমার নৌকোর পরের নৌকোতে এসেছেন নিশ্চয়ই? তাহলে আমার আগে কী করে এলেন? বিপ্রদাস জানালে, জঙ্গলের মধ্যে আমার রণপা ছিল। আমরা তো রণপা ব্যবহার করি। আমি বুঝলাম, নিশ্চিন্তিপুরে ভয়টা কোথায়! লোকটা ডাকাত। গ্রামের এক প্রাইমারি টিচার এসে বললেন, আপনি কলেজে পড়ান। ব্রাহ্মণ সন্তান। চলুন, আমার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করবেন। আমি বললাম , আমি যে বিপ্রদাসের বাড়িতে এসেছি। বিপ্রদাস বললেন, ওর জ্ঞান [illegible] হয়েছে। আমার বাড়িতেই খাবেন। কিন্তু আপনার জন্য কারিগর কী পাঠিয়েছে কে জানে? বাড়িতে তো কিছু নেই। এখানে কারিগর মানে বলরামচন্দ্র হাড়ি। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এরপর একটা খ্যাপলা জাল নিয়ে গিয়ে বিপ্রদাস নদীতে ফেললেন। একটা মাছ উঠল। তিনি বললেন, কারিগর এই আপনার জন্য একটা মাছ পাঠিয়েছেন। আহারের পর বললাম, আমি তো গানের জন্য এসেছি। বিপ্রদাস পূর্ণকে ডেকে পাঠালেন। পূর্ণ হালদারের বয়স প্রায় আশি বছর। বিপ্রদাসের বয়সও সত্তর বাহাত্তর। বললেন, কত গান শুনবেন! আমাদের হল গানের গোলাবাড়ি। আমাদের স্মৃতিতে অসংখ্য গান আছে। আপনার টেপ রেকর্ডার শেষ হয়ে যাবে। আমি জানালাম, আমার কাছে টেপ রেকর্ডার নেই এবং গানটা শুনতে চাই। তাঁরা অনেক গান আমাকে শোনাল। সৃষ্টিতত্ত্ব শোনালেন। আমি সেখানে থেকে গেলাম ও সমস্ত গান সংগ্রহ করলাম। সম্পূর্ণ মৌখিকভাবে সংগৃহীত আঞ্চলিক ইতিহাস। এই নিশ্চিন্তিপুরের সঙ্গে মেহেরপুরের একটা লিঙ্ক আছে। কেননা এই মেহেরপুরে বলরাম জন্মেছেন। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু মানুষজন চলে এসেছে নিশ্চিন্তিপুরে। এখানে এসে বলরামচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করেছে। কুষ্টিয়ার পাশে বারখেদা বলে একটা অঞ্চল আছে। সেখানে এখনও বলরাম হাড়িরা আছে। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে তারা দেখা করতে আসে।

আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতিক ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। আমরা খেয়াল করিনি। যাদের আমরা উপেক্ষিত বলে মনে করেছি, যে গানগুলিকে আমরা ভদ্র সমাজের উপযুক্ত বলে মনে করি না — আপনাদের জানিয়ে রাখি বলরামচন্দ্র হাড়ি সম্পর্কে যে বই আমি লিখেছি, তাতে সমস্ত সংগৃহীত গানগুলি আমি ছেপে দিয়েছি। স্বরলিপিও করে দিয়েছি কিন্তু আজ অবধি কোনও লোকসংস্কৃতির গায়ক বলরামচন্দ্রের গান গেয়েছেন বলে শুনিনি। এখানে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহ-কুষ্টিয়া-ছেঁউরিয়া গিয়েছিলেন, লালন ফকিরের গান সংগ্রহ করেছিলেন। 'বীণাবাদিনী'

পত্রিকায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে দিয়ে লালন গীতির স্বরলিপি করিয়েছিলেন। এখনও অবধি নির্ভরযোগ্য স্বরলিপি ওইটাই যা 'বীণাবাদিনী'-তে ছাপা হয়েছিল। আজকের মানুষ যদি জানতে চায় লালনের গান কেমন ছিল, ওই স্বরলিপিই সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার মানে এই নয় লোকে বলাহাড়ির গান শুনবে বলে আমার স্বরলিপিটা ব্যবহার করবে। তা কিন্তু আশা করা যায় না। আমাদের চোখটা রোগ গ্রস্ত হয়ে গেছে। যেটা দেখবার জিনিস, আমরা সবসময় দেখতে পাই না। এখানে আমার মনে হয়, আঞ্চলিক ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন, কত কাজ এর ভেতর হয়নি আমার সেটা বলতে খুব আগ্রহ হয়। যেটা হয়তো এ জীবনে পারলাম না। মানুষের জীবন তো সীমিত। আমি চেষ্টা করেছি তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে আমার মতো করে লেখবার। কিন্তু আমার মনে হয়ছে, আমি অনেক কাজ করতে পারিনি। সেরকম কিছু অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের কাছে বলব। যেমন ধরা যাক, এই যে আমাদের গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে, তাকে নিয়ে আজ অবধি কোনো কাজ হয়নি। গঙ্গার তীরে তীরে যে সব জায়গা আছে সেইগুলো ঘুরে দেখা হয়নি। আমি ঘুরে দেখেছি। আপনাদের কাছে একটা তালিকা পেশ করছি

সেই তালিকা উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে হুগলি হয়ে নদীয়া হয়ে বর্ধমানের দিকে চলে গেলে এই গঙ্গার ধারে ধারে অনেক জনপদ আছে। প্রথমে খড়দা। এটা নিত্যানন্দের জায়গা। আপনি কালনায় আসতে পারেন ওটা বৈষ্ণবদের আখড়া। সেখান থেকে সমুদ্রগড় চলে যেতে পারেন। সমুদ্রগড় পেরোলে নবদ্বীপ নবদ্বীপ পেরিয়ে পাটুলি। আর পাটুলি পেরোলে অগ্রদ্বীপ। এই অগ্রদ্বীপ পেরিয়ে কাটোয়া। এখানে শ্রীচৈতন্যের দীক্ষা হয়েছিল। সেখান থেকে একটা রাস্তা শ্রীখণ্ডের দিকে চলে গেল। আর একটা রাস্তা জ্ঞানদাস কাঁদড়ার দিকে চলে গেল। মাঝখানে শ্রীনিবাস আচার্যের যাজিগ্রাম। আমি বলতে চাইছি, খড়দা থেকে শ্রীখণ্ড পর্যন্ত বা কাঁদড়া জ্ঞানদাস পর্যন্ত যদি একটা রেখা টানা যায়, গঙ্গার তীরবর্তী একটা অঞ্চল, যে অঞ্চলটা ঘিরে চমৎকার এক আঞ্চলিক ইতিহাস লেখা যায়। সেটা হল বৈষ্ণবদের ইতিহাস। বৈষ্ণবদের তিনটি শ্রেণী—একটা হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব। এরা সৎ এবং শুদ্ধ বলে নিজেদের মনে করে। এরা শাস্ত্র ও জাত মানে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যতই সাম্যের কথা বলুক, এরা অব্রাহ্মণের কাছে দীক্ষিত হয় না। ব্রাহ্মণের কাছেই অব্রাহ্মণেরা দীক্ষিত হয়। এই হচ্ছে একটা ধারা। এর প্রতিবাদ করে যে ধারাটা তৈরী হল, তা হল জাত বৈষ্ণব ধারা। জাতবৈষ্ণব হল বৈষ্ণবদের থেকে বেরিয়ে আসা একটা প্রতিবাদী হল। যাদের মধ্যে জাতপাতের প্রতি তত অতিভক্তি নেই এবং যদি মেদিনীপুরে যাওয়া যায় দেখা যাবে, সেখানে, জাত বৈষ্ণবদের একটা বিরাট কেন্দ্র আছে। সেখানে শূদ্ররাই ব্রাহ্মণদের নির্দেশ দিচ্ছে। সব জায়গাতেই এই জাত বৈষ্ণবদের পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়ার উপায় কী? ধরা যাক, অগ্রদ্বীপের মেলা। শোনা যায় প্রায় পাঁচশো বছর ধরে হচ্ছে। এই মেলার যে ইতিহাস তা হল, গোবিন্দদাস বলে এক ব্যক্তি, তিনি শ্রীচৈতন্যের পরিকর ছিলেন। শ্রীচৈতন্য যখন পরিক্রমায় বেরিয়ে ছিলেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীচৈতন্য একদিন খেয়ে উঠে বললেন, একটু হরতুকী পেলে ভালো হতো। শুনে তাঁর শিষ্য গ্রাম থেকে হরতুকী এনে দিলেন আর আধখানা রেখে দিলেন। পরদিন অগ্রদ্বীপের কাছে এসে শ্রীচৈতন্য যখন আবার দুপুরবেলার খাবার খেলেন। খাওয়া শেষ হতেই তাঁর শিষ্য তাঁকে হরতুকী দিয়ে বললেন, আগের দিন একটু রেখে দিয়েছিলাম। শ্রীচৈতন্য তাকে বললেন, তোমার তো সঞ্চয় বাসনা যায়নি। তোমার আমার সঙ্গে যাওয়া হবে না। তুমি এখানেই থেকে যাও। এখানেই সংসার করো। এখানেই তোমার জীবন কাটুক।

গঙ্গার তীরে অগ্রদ্বীপ। সেখানে সেই শিষ্যের বিবাহের পর সন্তান হল। কিছুদিন পর স্নান করতে গেছেন। পায়ে কী যেন একটা ঠেকল। ভাবলেন শ্মশানের পোড়া কাঠ হবে হয়তো, তারপর দেখলেন পাথরের মতো—সেটা ব্রহ্মশিলা। সেটা নিয়ে গিয়ে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করা হল। অগ্রদ্বীপের পাশে দাঁইহাট। সেখানে ওই পাথরের মূর্তি তৈরি হয় বহুদিন থেকে। সারা পশ্চিমবঙ্গে যত কৃষ্ণমূর্তি আছে,

পত্রিকায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে দিয়ে লালন গীতির স্বরলিপি করিয়েছিলেন। এখনও অবধি নির্ভরযোগ্য স্বরলিপি ওইটাই যা 'বীণাবাদিনী'-তে ছাপা হয়েছিল। আজকের মানুষ যদি জানতে চায় লালনের গান কেমন ছিল, ওই স্বরলিপিই সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার মানে এই নয় লোকে বলাহাড়ির গান শুনবে বলে আমার স্বরলিপিটা ব্যবহার করবে। তা কিন্তু আশা করা যায় না। আমাদের চোখটা রোগ গ্রস্ত হয়ে গেছে। যেটা দেখবার জিনিস, আমরা সবসময় দেখতে পাই না। এখানে আমার মনে হয়, আঞ্চলিক ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন, কত কাজ এর ভেতর হয়নি আমার সেটা বলতে খুব আগ্রহ হয়। যেটা হয়তো এ জীবনে পারলাম না। মানুষের জীবন তো সীমিত। আমি চেষ্টা করেছি তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে আমার মতো করে লেখবার। কিন্তু আমার মনে হয়ছে, আমি অনেক কাজ করতে পারিনি। সেরকম কিছু অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের কাছে বলব। যেমন ধরা যাক, এই যে আমাদের গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে, তাকে নিয়ে আজ অবধি কোনো কাজ হয়নি। গঙ্গার তীরে তীরে যে সব জায়গা আছে সেইগুলো ঘুরে দেখা হয়নি। আমি ঘুরে দেখেছি। আপনাদের কাছে একটা তালিকা পেশ করছি।

সেই তালিকা উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে হুগলি হয়ে নদীয়া হয়ে বর্ধমানের দিকে চলে গেলে এই গঙ্গার ধারে ধারে অনেক জনপদ আছে। প্রথমে খড়দা। এটা নিত্যানন্দের জায়গা। আপনি কালনায় আসতে পারেন। ওটা বৈষ্ণবদের আখড়া। সেখান থেকে সমুদ্রগড় চলে যেতে পারেন। সমুদ্রগড় পেরোলে নবদ্বীপ নবদ্বীপ পেরিয়ে পাটুলি। আর পাটুলি পেরোলে অগ্রদ্বীপ। এই অগ্রদ্বীপ পেরিয়ে কাটোয়া। এখানে শ্রীচৈতন্যের দীক্ষা হয়েছিল। সেখান থেকে একটা রাস্তা শ্রীখণ্ডের দিকে চলে গেল। আর একটা রাস্তা জ্ঞানদাস কাঁদড়ার দিকে চলে গেল। মাঝখানে শ্রীনিবাস আচার্যের যাজিগ্রাম। আমি বলতে চাইছি, খড়দা থেকে শ্রীখণ্ড পর্যন্ত বা কাঁদড়া জ্ঞানদাস পর্যন্ত যদি একটা রেখা টানা যায়, গঙ্গার তীরবর্তী একটা অঞ্চল, যে অঞ্চলটা ঘিরে চমৎকার এক আঞ্চলিক ইতিহাস লেখা যায়। সেটা হল বৈষ্ণবদের ইতিহাস। বৈষ্ণবদের তিনটি শ্রেণী—একটা হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব। এরা সৎ এবং শুদ্ধ বলে নিজেদের মনে করে। এরা শাস্ত্র ও জাত মানে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যতই সাম্যের কথা বলুক, এরা অব্রাহ্মণের কাছে দীক্ষিত হয় না। ব্রাহ্মণের কাছেই অব্রাহ্মণেরা দীক্ষিত হয়। এই হচ্ছে একটা ধারা। এর প্রতিবাদ করে যে ধারাটা তৈরী হল, তা হল জাত বৈষ্ণব ধারা। জাতবৈষ্ণব হল বৈষ্ণবদের থেকে বেরিয়ে আসা একটা প্রতিবাদী হল। যাদের মধ্যে জাতপাতের প্রতি তত অতিভক্তি নেই এবং যদি মেদিনীপুরে যাওয়া যায় দেখা যাবে, সেখানে, জাত বৈষ্ণবদের একটা বিরাট কেন্দ্র আছে। সেখানে শূদ্ররাই ব্রাহ্মণদের নির্দেশ দিচ্ছে। সব জায়গাতেই এই জাত বৈষ্ণবদের পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়ার উপায় কী? ধরা যাক, অগ্রদ্বীপের মেলা। শোনা যায় প্রায় পাঁচশো বছর ধরে হচ্ছে। এই মেলার যে ইতিহাস তা হল, গোবিন্দদাস বলে এক ব্যক্তি, তিনি শ্রীচৈতন্যের পরিকর ছিলেন। শ্রীচৈতন্য যখন পরিক্রমায় বেরিয়ে ছিলেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীচৈতন্য একদিন খেয়ে উঠে বললেন, একটু হরতুকী পেলে ভালো হতো। শুনে তাঁর শিষ্য গ্রাম থেকে হরতুকী এনে দিলেন আর আধখানা রেখে দিলেন। পরদিন অগ্রদ্বীপের কাছে এসে শ্রীচৈতন্য যখন আবার দুপুরবেলার খাবার খেলেন। খাওয়া শেষ হতেই তাঁর শিষ্য তাঁকে হরতুকী দিয়ে বললেন, আগের দিন একটু রেখে দিয়েছিলাম। শ্রীচৈতন্য তাকে বললেন, তোমার তো সঞ্চয় বাসনা যায়নি। তোমার আমার সঙ্গে যাওয়া হবে না। তুমি এখানেই থেকে যাও। এখানেই সংসার করো। এখানেই তোমার জীবন কাটুক।

গঙ্গার তীরে অগ্রদ্বীপ। সেখানে সেই শিষ্যের বিবাহের পর সন্তান হল। কিছুদিন পর স্নান করতে গেছেন। পায়ে কী যেন একটা ঠেকল। ভাবলেন শ্মশানের পোড়া কাঠ হবে হয়তো, তারপর দেখলেন পাথরের মতো—সেটা ব্রহ্মশিলা। সেটা নিয়ে গিয়ে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করা হল। অগ্রদ্বীপের পাশে দাঁইহাট। সেখানে ওই পাথরের মূর্তি তৈরি হয় বহুদিন থেকে। সারা পশ্চিমবঙ্গে যত কৃষ্ণমূর্তি আছে,

বেশিরভাগ দাঁইহাটের তৈরী। তিন-চারশো বছরের ঐতিহ্য। দাঁইহাটে গোপীনাথের মূর্তি তৈরি হলো। গোপীনাথকে বসানো হলো ও গোবিন্দদাস গোপীনাথের সাধনা করতে লাগলেন। কিছু কাল পরে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হলো। পুত্র বিয়োগও হলো। তখন তিনি শ্রীচৈতন্যকে মনে মনে সম্বোধন করে বললেন, ঠাকুর আপনার সঙ্গে যাচ্ছিলাম, নিলেন না। আমাকে সংসারী করলেন। সংসারের মায়ায় পড়লাম। স্ত্রী ও সন্তান বিয়োগ হয়েছে। আমি সংসারে থাকতে চাই না। গঙ্গা গর্ভে নিজেকে আত্মাহুতি দেব। তখন তাঁকে কৃষ্ণ দেখা দিয়ে বললেন, সন্তান থাকলে কী হতো? ওই আমার শ্রাদ্ধ করত। কৃষ্ণ বললেন, ঠিক আছে আমি তোমার শ্রাদ্ধ করব। এখনও যদি চৈতী একাদশীতে অগ্রদ্বীপে যাওয়া যায় তবে দেখা যাবে, ওখানে যে গোপীনাথের মূর্তি আছে, তাকে একটা কাছা পরানো হয়। সেই গোপীনাথের মূর্তিতে আজ পর্যন্ত হাতে করে পিণ্ড দেওয়া হয়। আমি তো চল্লিশ বছর ধরে দেখছি। রোমাঞ্চকর দৃশ্য। অজস্র লোক আসে সেই পিণ্ডদানটা দেখবে বলে। পিণ্ডটা হালকা করে এমনভাবে মাখা হয় যাতে স্খলিত হয় তাড়াতাড়ি। যাতে চট্ করে খুলে যায়। সবাই বলে পিণ্ড দিয়েছে ওরা। এই যে লোকবিশ্বাস এই যে একটা গড়ে ওঠা সংস্কৃতি—আমি সেখানে বসে বসে দেখেছি। কারা আসছে চুপ করে দেখে যাচ্ছি।

মেলার একটা বিস্তার আছে, তা দেখতে, মেলায় আগের দিন রাতে যেতে হয়। ভোর থেকে দেখতে হয় যে কারা আসছে। যদি কোনোদিন কেঁদুলির মেলায় যাওয়া যায়, যদি সূচনার আগের দিন যাওয়া যায়, দেখা যাবে একটা জনপদ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কীভাবে ভরে ওঠে। দুর্গাপুর থেকে যাচ্ছে। নদীয়ার দিক থেকে আসছে। বীরভূম-বর্ধমান থেকে যাচ্ছে। কেঁদুলি মুহূর্তের মধ্যে ভর্তি হয়ে গেল কয়েক লক্ষ লোকে। সেইরকম অগ্রদ্বীপে দেখলাম লোক আসছে। আমিও তাদের সঙ্গে গেছি বালিয়াড়ি ভেঙে। সেখানে বিশাল বালিয়াড়ি। প্রায় মাইল খানেক সেখান দিয়ে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে খুব তেষ্টা পাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়ছি। কাকারি বলে একটা ফল বিক্রি হয়। শশার মতো দেখতে। লম্বা। চিবোতে চিবোতে জল পাওয়া যায়। মাঝে একটা লোক তালের রস বিক্রি করছে। এক গ্লাস খেয়ে নিলে, হাঁটতে পারা যায়। আমি তপ্ত বালুর ওপর দিয়ে হাঁটছি। চৈত্র মাস। অগ্রদ্বীপ যখন পৌঁছলাম, আমার সঙ্গে অজস্র লোক কিন্তু যাচ্ছে। চলেছেই। আমি ওখানে গিয়ে সমীক্ষা করলাম। যারা এসেছে সেই আখড়াগুলোতে সব গেলাম। গিয়ে বললাম, আপনারা কোথা থেকে আসছেন? সব কাগজে টুকতে থাকলাম। কোন কোন অঞ্চল থেকে তারা আসছে। আমি জানতে চাইলাম, আচ্ছা এত জায়গা থাকতে আপনারা এই নবদ্বীপের চারপাশে এলেন কেন? এই নবদ্বীপ এই পাটুলি এই যে অগ্রদ্বীপ—এইসব জায়গায় এত উদ্বাস্তু কেন? বলল, এত উদ্বাস্তু কেন জানেন? আসলে যখন আসতেই হবে তখন আমরা ভাবলাম, গৌর-গঙ্গার দেশে যাই। গৌর-গঙ্গা কেন জানেন? পূর্ববঙ্গে গৌরও নেই আর গঙ্গাও নেই। এখানে দুই আছে। কাজেই একজন নিম্নস্তরের যে সাধারণ মানুষ, ভক্ত মানুষ তারা কিন্তু অগ্রদ্বীপকে মহিমার দিক থেকে, একটা দিক দিয়েই জানে যে — গৌর-গঙ্গার দেশ। একই সঙ্গে গৌরকেও পাব আবার গঙ্গাস্নানও করব।

এখানকার ইনফ্রাসস্ট্রাক্চার যদি দেখেন অবাক হয়ে যাবেন। অগ্রদ্বীপে যারা যায় গোরুর গাড়ি করে যায়। যেত বললেই ভালো হয়, এখন আর গোরুর গাড়ি যায় না। আগে দেখতাম, কাঠ-খড় পাটকাঠি নিয়ে যাচ্ছে। অড়হর গাছের ডাল পালা নিয়ে যাচ্ছে। অড়হরের ডাল পালা লম্বা লম্বা হয়। সেটা শুকনো নিয়ে যাচ্ছে। তারপর মাটি খুঁড়ছে। রান্না করছে। মাটি খুঁড়ে কোথাও ডাল রাখছে। ভাত রাখছে। কারণ রাঢ়ের মাটি পাথরের মতো শক্ত। আমি দিনের পর দিন খেয়েছি। কখনও রোগের আক্রমণ হয়নি। এটা নদীয়া বা বর্ধমানে পাওয়া যাবে কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় হবে না। কাদা মিশে যাবে। তুলনায় অগ্রদ্বীপের মাটি হচ্ছে একবারে ইট। আমার তখন ফুল্লরায় বারোমাস্যার কথা মনে পড়ল যে 'আমানি খাবার গর্ত দ্যাখো বিদ্যমান'। সে বলেছিল আমাদের বাসনপত্র তো কিছু

নেই। আমানির জন্য একটা গর্ত করে রেখেছি, ওখানেই আমানিটা ঢেলে আমরা খেয়ে নিই। অগ্রদ্বীপে যারা রান্না করে কী দিয়ে করে? একটা নারকেল মালা ফুটো করে তাতে বাঁকারি ঢুকিয়ে দেয়, হয়ে গেল হাতা। মাটির হাঁড়িতে রান্না হয়। আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি, একজন বুড়ি রান্না করছে। ভাতের ফ্যানটা উথলে উঠছে। আলু দেখলাম। কুমড়ো-বেগুন-পটল দেখলাম। সব স্রোতের মতো উঠে আসছে নেমে আসছে। সব টগবগ করে ফুটছে। ডাল ফুটছে। আমি বললাম কী হচ্ছে? বলল, একদম জগাখিচুড়ি। জগাখিচুড়ি কথাটা ছোট থেকে শুনছি, জগাখিচুড়ি প্রথম চোখে দেখলাম। বলল, এটা পঞ্চতত্ত্ব। পঞ্চতত্ত্ব কেন? জানাল, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, দামোদর, শ্রীনিবাস এই পাঁচটা মিশিয়েছি। পাঁচরকম দিয়ে। পঞ্চতত্ত্ব খাওয়া হল। দেখলাম ইতিহাসের কোথায় এদের স্থান। ওই বুড়িকে কোনোদিন আমরা আমাদের শিক্ষিত সাহিত্যে আনতে পেরেছি কী? ওইখানেই যখন একটা আখড়ায় গিয়ে বসলাম, সামনে দেখছি একটা ছোট নর্দমার মতো, যাকে বলে : জো-ল। সেই জোলের ওপর একটা করে পাঁচসেরি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছে। এক একটা হাঁড়িতে পাঁচসের করে ভাত হবে। পরপর হয়তো দশটা হাঁড়িতে বসিয়ে দিল, এখানে দশটা হাঁড়িতে একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণ ভাত হয়ে গেল। পাশে বিরাট গর্ত খুঁড়েছে। সেই গর্তগুলো হলুদের গুঁড়ো দিয়ে ডিস্-ইনফেক্ট করেছে। সেখানে ভাত ঢেলে দিল। এক গর্তে তরকারি ঢেলে দিল। ডাল ঢেলে দিল। বলল, তোমরা সব বসে পড়ো। খেয়ে নাও। কীসে খাব? কেন, পদ্মপাতায়। এখানে তো আর থালা পাওয়া যায় না। কী জল খাব? কেন, গঙ্গাজল। এখানে তো আর জল পাওয়া যায় না।

এই যে গ্রামীণ ইনফ্রাসস্ট্রাকচার, সেখানে জলও নেই। ব্যবস্থাও নেই। সেখানেই আমরা কয়েক রাত কাটিয়ে এলাম। থাকলাম, খেলাম আর ওদের সঙ্গে গান করলাম। ওদের কথাবার্তা শুনলাম। জিগ্যেস করলাম, এই যে অগ্রদ্বীপের মেলা, যখন ষাটের দশকে দেখেছি — বেশি লোকজন নেই। এই আশি-নব্বইয়ের দশকে এসে দেখলাম, অজস্র লোক আসছে। কারণটা কী? কারণ উদ্বাস্তুরা আসছে। এই উদ্বাস্তুরা কারা? তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে দেখলাম, তারা সবাই জাত বৈষ্ণব। ওই দিন অগ্রদ্বীপে এসে ওরা মালসা ভোগ দেয়। গোপীনাথের সামনে মালসা ভোগ দেওয়া জাত বৈষ্ণবদের একটা কৃত্য। অগ্রদ্বীপের মেলায় কিন্তু আগে জাত বৈষ্ণবরা আসত না। কাজেই এর ভেতর মেলাটা প্রসারিত হয়ে গেল। একটা বিস্তার তৈরি হয়ে গেল। ধীরে ধীরে অনেক মানুষের অংশগ্রহণ শুরু হয়ে গেল। তার সঙ্গে অনেকগুলো অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। মাইক এল। বাউলগানের কথকতা শুরু হল। নানারকম খারাপ ছেলেমেয়েরা আসতে শুরু করল। মদ্যপানের দোকানও হয়েছে। বার আছে। দেশি-বিদেশি সব মদই পাওয়া যায়। গাঁজার ঠেক তো বহুদিন ধরেই ছিল। কিন্তু আমার কাজ কী? আমার কাজ হল ওর মধ্যে থেকে দেখা। জাত বৈষ্ণবদের একটা দাঁড়াবার জায়গা একটা মিলনের ক্ষেত্র তৈরি হলো।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, ঘোষপাড়ায় যে কর্তাভজার মেলা হয়, সেখানে আমি ষাটের দশক থেকে প্রায় চল্লিশ বছর যাচ্ছি। আগে যেমন দেখতাম, কোনও একটি গাছের তলায় ফকির বা বাউল বসে আছে। তারা গান গাইছে। তাদের ঘিরে নানা লোকের ভিড়। এখন আর তা হয় না। কলকাতা থেকে লরি-গাড়ি-ম্যাটাডর সব যাচ্ছে। কলকাতার বাবুরা সব নামছেন সেখানে। টেন্ট করছেন। পিকনিক হচ্ছে। কর্তাভজা মেলার বারোটা বেজে গেছে। পাবলিকের বিষয় হয়ে গেছে সেটা। এই যে কর্তাভজা যাদের কথা বলছি, আমার মনে পড়ল আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিবিদ ড. ভবতোষ দত্ত একটি সমাবর্তন ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন। সেই সমাবর্তন ভাষণের একটা কপি আমার কাছে উনি পাঠিয়েছিলেন। ওখানে উনি ঘটনাচক্রে আমার নাম উল্লেখ করেছিলেন। উনি বলেছিলেন, বাঙালির নিজস্ব আঞ্চলিক ইতিহাস যদি লিখতে হয়, তবে ভাটপাড়া থেকে শুরু করে নবদ্বীপ পর্যন্ত চলে যেতে হবে। ভাটপাড়া থেকে নবদ্বীপ ভক্তি সাধনার এক উর্বর জায়গা আছে

লোকধর্মের। লক্ষ করে দেখবেন, এখানে কর্তাভজা হয়েছে। সাহেবধনী হয়েছে। খুশি বিশ্বাস আছে বলরামী হয়েছে। এই যে নবদ্বীপ থেকে ভাটপাড়া পর্যন্ত একটা অদ্ভুত চলাচল, ভেতরকার প্রচ্ছন্ন চলাচল, বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। বাসে ট্রাকে ঘুরলে বোঝা যাবে না। কিন্তু এসব জায়গায় ভাবের একটা নিজস্ব উর্বরতা রয়েছে। ভাটপাড়া যান, গেলে দেখবেন মানুষের ভেতর একটা উদার্য আছে। অগ্রদ্বীপে যান ভক্ত, ভক্তচিত্ত। যাজিগ্রামে যান, শ্রীনিবাস আচার্যের ওখানে, চলে যান শ্রীখণ্ডে — প্রচুর বৈষ্ণবকে পাবেন। প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণব হচ্ছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণব হচ্ছে। জাত বৈষ্ণব আর তৃতীয় বৈষ্ণব হচ্ছে সহজিয়া বৈষ্ণব। যাদের এক কথায় বলা হয় 'সহজে'। নবদ্বীপে একটা সহজে পাড়া আছে।

নবদ্বীপে এখন কিছু কিছু জিনিস আঞ্চলিকভাবে পাওয়া যায়। যেমন একটা রাস্তার নাম হচ্ছে, ঢপওয়ালির মোড়। সেখানে ঢপ কীর্তনের একটা বড় জায়গা ছিল। সে সময় আমরা টেপ করিনি। তাদের গান সংগ্রহ করিনি। নবদ্বীপের কীর্তন সমাজ যারা, কীর্তন গেয়ে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন, সেই কীর্তনীয়াদের নিয়ে আমরা কাজ করিনি। নবদ্বীপে যে অজস্র মন্দির আছে, সেইসব মন্দিরে যে অনেক মহিলার নামকীর্তন করে গ্রাসাচ্ছাদন করেন, তাঁদের ইতিহাস আমরা লিখিনি। আমি অগ্রদ্বীপের পাশে দাঁইহাটের সহজিয়া পাড়ায় গেছি। এই সহজিয়াদের একটি নিজস্ব শাস্ত্র আছে। বইটার নাম আদ্য কৌমুদী। হাতে লেখা পুঁথি। আমি সেখানে গিয়ে বললাম, আপনাদের পুঁথি একটু দেখতে পারি? হ্যাঁ, দেখুন। নকল করতে পারি? হ্যাঁ, পারেন নিয়ে যান। দিয়ে যাবেন। আমাকে বিশ্বাস করছেন? অবশ্যই, বিশ্বাস করাটাই তো আমাদের ধর্ম। সত্যি সত্যি পুরো বইটা কপি করলাম। তখন জেরক্স মেশিন ছিল না। হাতে লিখে কপি করে ফেরত দিতে গেলাম, বলল, আদ্য কৌমুদী পড়লেন? কিছু বুঝলেন? কী করে বুঝলেন? আপনি তো গুরুর কাছে দীক্ষা নেননি! আমরা যে গুরুর কাছে দীক্ষিত। চলুন গুরুর কাছে আপনাকে নিয়ে যাই। গুরুর কাছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম তিনি মুসলমান ফকির। বলল, আমাদের হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই বুঝেছেন। উনি ফকির তাতে কী হয়েছে! উনিই আমার গুরু। এই প্রসঙ্গে বলি, অগ্রদ্বীপের মেলায় গিয়ে দেখেছিলাম, একটা জায়গায় কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে। দুজন লোক গান গাইছে। আরো একজন লোক গানের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছে। আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, লোকটা খুব চেনা। আমাদের বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ করেছে। আমি বললাম, তুমি এখানে? বলল, আমার সব শিষ্যরা এসেছে। আমার কাছে যে রাজমিস্ত্রি, আসলে সে এক লৌকিক সম্প্রদায়ের গুরু! সে অসামান্য সব বাউলগানের যে ব্যাখ্যা দিতে লাগল, আমি ভাবলাম এই লোকটাকে আমি আশি-নব্বই টাকা দিয়ে বাড়ির কাজে নিয়োগ করেছিলাম! আমার সেই নিয়োগ করার সত্যিই কি সেই অধিকার আছে? আমি তো লোকটাকে চিনি না। জানি না। এই লোকটা আমাকে যে শিক্ষা-দীক্ষা দিল। বোঝাল। সাধারণ মানুষকে এরাই পথ দেখাচ্ছে।

তা সহজেরা আমাকে নিয়ে গেল তাদের গুরুর কাছে। আগেই বলেছি লোকটা মুসলমান। আমি বললাম, আপনাকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞেস করব? আপনি বলবেন? নিশ্চয় বলব, যতটুকু আমার জ্ঞানে আসে। উনি আমাকে বললেন, আপনি কী করেন? আমি বললাম, এই তো মুশকিলে ফেললেন! আমি জানি যদি বলি কলেজে পড়াই, সব দূরে সরে যাবে। আমি জানালাম, এ পথে ঘুরছি। জানবার চেষ্টা করছি। উনি বললেন, আপনার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে : আপনি জ্ঞানের পথের লোক। রসের পথের লোক নন। কী করে বুঝলেন? আপনার শব্দ দিয়ে বুঝতে পারছি। বাক্য দিয়ে বুঝতে পারছি। কী বাঁধুনি কথাবার্তার। জ্ঞানের লোক ছাড়া হয় না। কীরকম? আমাদের এই বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের কথাই বলছি। একটা বাড়িতে কীর্তন হচ্ছে। ওরা নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছে। বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের লোকজনকে তারা বলছে, প্রসাদ খাও। ওরা বলেছে আমরা তো উচ্ছিষ্ট জিনিস খাই না। উচ্ছিষ্ট!! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়েছে সাত্ত্বিক মতে, উচ্ছিষ্ট হয় কি করে? কেন কৃষ্ণ তো খেয়েছেন!

ওঁর খাওয়ার পর আমরা খাই না। বোঝা গেল লোকটা হয়তো বলাহাড়ির দুশো বছর পর জন্মেছে, কিন্তু ওই চেতনাটা তার ভেতর ক্রিয়াশীল যে, বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের লোক সে। বৈষ্ণবরা দিয়েছে বলে খেয়ে নেবে সে হয় না। এতো উচ্ছিষ্ট!

সেই রকমই এক অন্ধ ফকিরের কাছে গিয়ে একবার দাঁড়িয়েছিলাম। তাঁকে বললাম যে, আপনার কাছে কয়েকটি বিষয় জানতে চাই। হ্যাঁ, বলুন। আর জানবার কী আছে? আমাদের ধর্মে চলে আসুন না। আমি বললাম, না তাতে একটু অসুবিধা আছে। ও আচ্ছা। আমি বললাম, চর্যাপদে পড়েছি, শশিভূষণ দাশগুপ্ত আমাদের ক্লাসে চর্যাপদ পড়াতেন, পড়িয়ে মুনিদত্তের একটা সংস্কৃত টীকা পড়াতেন। পদগুলো পড়িয়ে বলছিলেন এগুলো দুর্বোধ্য পদ। অর্ধেকের মানে হয় না। চর্যাপদে অর্ধেক শব্দের মানে হয় না! আমি ওঁনাকে বললাম, একটা চর্যাপদের মানে করে দেবেন? কী রকম? 'বুখেরো তিন্তিরি কুম্ভীরে খায়' — উনি বললেন, তার মানে বৃক্ষের কেতু কুমিরে খাচ্ছে। বৃক্ষ মানে কী বলুন তো? গৃহ। মানুষ। পুরুষ। তেঁতুল কী বলুন তো? বীর্য। কে খাচ্ছে? কাম নামক কুমির। আমি ভাবলাম, এক হাজার বছরের যবনিকা সরে গিয়ে চর্যাপদের ব্যাখ্যা যা আমাদের মহামহোপাধ্যায় শশিভূষণ দাশগুপ্ত দুর্বোধ্য বা প্রহেলিকা মানে করেছিলেন, সেটার কিন্তু একটা স্পষ্ট মানে আছে। আমার মনে পড়ে, অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত আমাকে ঈশ্বরগুপ্ত পড়াতে গিয়ে, ঈশ্বরগুপ্তের 'বোধেন্দুবিকাশ' কাব্যের মধ্যে আছে না 'দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহানো ভার'— উনি বলেছিলেন, দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে বলে কোনও কথা হয় নাকি! উনি বললেন, বুঝতেই পারছো এগুলো প্রহেলিকা। আমি ফকিরকে জিজ্ঞেস করলাম : 'দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহানো ভার' এর মানে কী? তার আগে বললাম : 'বুখেরো তিন্তিরি কুম্ভীরে খায়' এর মানে কি হল? বললেন, মানুষ রূপ বৃক্ষের বীর্য, তা পান করছে কাম নামক কুমির। তাই সাবধান হতে হবে। আর 'দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহানো ভার' এর মানে, মহিলাদের রজঃস্রাব হয় না, তার দিন রাত আছে নাকি? দিনে-দুপুরে রজঃস্রাব হতে পারে। আমি দেখলাম, বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় যেমন নেমে আসে, বহু শতাব্দী পেরিয়ে একটা শব্দ, একটা পদ, একটা বাক্যবন্ধ, কাব্যের ভাষা ও ভাষ্য আমাদের কাছে সেটা আসছে আমরা ফকিরদের কাছ থেকে সেটা জানবার চেষ্টা করেছি, তাতে খারাপ কিছু নেই।

কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা হচ্ছে, আঞ্চলিক ইতিহাসে— দুটো ইতিহাসের কথা আপনাদের সমান্তরালভাবে বলে গেলাম যে— এক, খড়দা থেকে শ্রীখণ্ড যাজিগ্রাম পর্যন্ত বৈষ্ণবদের কথা— তাতে গৌড়ীয় সহজিয়াদের ধারা। অন্যদিকে ভটপাড়া থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত যে ভূখণ্ড তার মধ্যে জেগে ওঠা লোকধর্মেরস্রোত। এই দুটি অঞ্চলই যদি আমরা চর্চার মধ্যে আনতে পারি, ব্যাখ্যানের ভেতর আনতে পারি, যদি ইতিহাসের তত্ত্বকে এর অন্তরে প্রয়োগ করতে পারি, মানুষের বেঁচে থাকবার যে প্রয়াস তা উঠে আসবে। আমাদের বেঁচে থাকাটা যে একমাত্র ঠিক তা তো নয়। এই যে কোট-প্যান্ট-স্যুট পরে শহরের মধ্যে বাস করে দুর্দান্ত জীবন কাটাচ্ছি আর সবচেয়ে আধুনিক গ্যাজেটগুলো হাতের মধ্যে আছে। সবই আমাদের করায়ত্ত। কর্ণায়ত্ত বটে। এখন দু-কান দিয়ে গান শুনতে শুনতে অনেকে যায়। গানের এমন প্রগাঢ় ব্যাপ্তি আগে দেখিনি। আর আমরা গান শোনার জন্য চুপ করে বসে থাকতাম। এক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত অমিয়নাথ সান্যাল, তাঁর কাছে যেতাম। তিনি বললেন, কী ব্যাপার কী জানতে চান? আমি বললাম, গান শুনতে চাই। কী গান? 'নিশীথ রাতের বাদল ধারা'। আসছি বলে গিয়ে একটা এস্রাজ নিয়ে এলেন। 'নিশীথ রাতের বাদল ধারা' শোনাচ্ছেন। আমি বললাম, এ কি আপনার সঙ্গে তো আমারটা মিলছে না! উনি বললেন, আপনি কোথা থেকে শিখেছেন? আমি বললাম, স্বরবিতানে এটা আছে। উনি তখন বললেন, স্বরবিতান! আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে গানটা শুনেছি।

সেইরকম রামকৃষ্ণ আচার্য বলে একজন সহজিয়া বৈষ্ণবের কাছে গেলাম। তিনি একটা বিশাল

প্রাঙ্গণে থাকেন। আমি গিয়ে জানালাম, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। লোকজন বলল, এখন তো সকালবেলা, উনি আশ্রম পরিক্রমা করছেন। দেখলাম উনি অন্ধ। শিষ্যের কাঁধে হাত রেখে পুরো আশ্রমটা ঘুরছেন। আমি দাওয়ায় বসে আছি। উনি এক পাক দিয়ে এসে আমার কাছে এসে বললেন, একজন নতুন মানুষ এসেছে বলে মনে হচ্ছে। আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু কী করে বুঝলেন? উনি বললেন, বোঝা যায়। আমার আশ্রমে গাছপালা আছে। পাখি-পশু আর মানুষও আছে। কিন্তু নতুন মানুষ এলে বোঝা যায় গায়ের গন্ধে। তা উনি বললেন, কী ব্যাপার? আমি আপনার কাছে কিছু কথা জানতে এসেছি। আপনি কী করেন? বললাম, কলেজে পড়াই। ও জ্ঞানের পথের পথিক। আপনার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই। চললাম। এই বলে আবার একটা পরিক্রমায় চলে গেলেন। দ্বিতীয় পরিক্রমার শেষে এসে বললেন, আপনি কী জানতে চাইছিলেন যেন! আমি আপনার কাছে কিছু গান শুনতে চাই। গান শুনবেন মানে? আপনি কি নিজে গান জানেন? হ্যাঁ, জানি। ঠিক আছে আমি আবার আসছি।

আর একটা পরিক্রমা শেষ করে এসে বললেন, আপনি কোথায় বসে আছেন? দাওয়ায় বসে আছি। এই, ওকে একটা চেয়ার দাও। আমি বললাম, চেয়ারে বসব না। আপনার সামনে চেয়ারে বসা যাবে না। উনি বললেন, তাহলে দাওয়ায় বসবেন? আমি বললাম, আপনিও আমার সঙ্গে এসে বসুন দাওয়ায়। উনি দাওয়ায় বসলেন। আমি নীচে বসলাম। উনি বললেন, নীচে বসলেন কেন? জানালাম যে, আপনার মতো প্রাজ্ঞের তো সমস্থানে বসতে পারি না। আপনার তো খানিকটা জ্ঞান হয়েছে দেখছি। গান শুনবেন? আপনি গান জানেন? আচ্ছা, একটা গান শোনান তো দেখি। আমি পড়লাম জীবনের আশ্চর্য বিপদে। এই লোকটাকে আমি কী গান শোনাব? সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত এখানে ব্যর্থ। এঁকে শোনানো যাবে না। অনেক ভেবেচিন্তে অতুল প্রসাদের একটা গান গাইলাম : 'সবারে বাসলে ভালো / নইলে মনের কালো ঘুচবে নারে / আছে তোর যাহা ভালো / ফুলের মতো দে সবারই'। এইটাই শোনালাম। শুনতে শুনতে বললেন, ভৈরবী না! এই গানটা যে লিখেছিল তাঁর মনে খুব দুঃখ ছিল না? ভাবুন গান শুনতে শুনতে একটা লোক গানের ভিতরে চলে গেছে। গীতিকারের দুঃখের জীবন ছিল কিনা জানতে চাইছেন। হ্যাঁ, খুব দুঃখের জীবন ছিল। ভালোবেসে যাকে বিয়ে করেছিলেন, তার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে পারতেন না। লক্ষ্ণৌ শহরে অতুলপ্রসাদ একটা বাড়িতে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী আর একটা বাড়িতে। দুজনে একই গান গাইতেন : 'নিদ নাহি আখিঁপাতে'। আমিও একাকী। তুমিও একাকী। খুবই দুঃখের জীবন। উনি বললেন, গানের মধ্যে দুঃখটা রয়েছে। খুব ভালো লাগল। ঠিক আছে। তোমাকে কয়েকটা গান শোনাব। বলে কয়েকটা গান শোনালেন। গানটা কিন্তু মানে শুনে বুঝতে হবে। গাইলেন : 'তুমি ঘুমালে যিনি জেগে থাকেন / সেই তো তোমার গুরু বটে / তাকে ভালোবাসো নিষ্ঠা ভরে'। গানটা থামিয়ে দিয়ে বললেন, কে গুরু বলো তো? তুমি ঘুমোলে যিনি জেগে থাকেন? আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধিতে বললাম যে, চেতনা। উনি বললেন, না, না জেগে থাকে শ্বাস। সেই গুরু। জানো তো শ্বাসকে বশীভূত করতে হয়। শ্বাসগুরুর কাছে তুমি যদি নতজানু হতে পার, সেই গুরু যদি কৃপা করে তবে তুমি বেঁচে থাকবে। এই গুরু যেদিন তোমায় ছেড়ে চলে যাবে, সেদিন তুমি মৃতদেহে পরিণত হবে। তাই তুমি ঘুমোলে যিনি জেগে থাকেন— সেই তো তোমার গুরু বটে। তাকে ভালোবাসো নিষ্ঠা ভরে। চেষ্টা করো নিজের দেহকে বুঝতে। নিজের দেহের ভিতর শ্বাসযন্ত্রকে বোঝবার। চেষ্টা করো নিজের শ্বাসকে সংযত করবার। উনি বললেন, এই গান সবাইকে শোনাই না। তুমি গান গাইতে পারো বলে তোমাকে শোনালাম।

আমাদের দেশে যাঁরা লোকসংস্কৃতির চর্চা করেছিলেন, তার ভিতর আমার অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ সহ আরো অনেকেই ছিলেন। গানের মধ্যে দিয়ে লোকসংস্কৃতিকে জানা যায়। গানের ভিতর একটা আঞ্চলিকতা আছে। বাংলায় কীর্তনের যে আশ্চর্য বিস্তার, তা

কিছুতেই লোকসংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে নয়। আমাদের কীর্তন গান, ফকিরা গান, মুর্শিদা গান— কীর্তনের গানের যে বুনিয়াদটা আছে, কীর্তনের কৌশল আছে সেটা জানা থাকলে বেশি করে অনুভব করা যায়। সেইজন্য আমার মনে হয় আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির চর্চা যাঁরা করবেন, সেই চর্চার মধ্যে দিয়ে যারা ধরতে চাইবেন ইতিহাসকে, সেই সত্যকে, তাদের পরিক্রমার পথ বড় কঠিন। কিন্তু তাকে তৈরি হতে হবে। নিজেকে তৈরি করাটাই সবচেয়ে বড় সাধনা। আপনাদের কাছে বড় বড় কথা বলার জন্য বলছি না। আপনারা সকলেই পূজনীয় এবং শ্রদ্ধেয় ও বয়ঃপ্রবীণ। আপনাদের এসব কথা আমার পক্ষে বলা মানায় না। আজকে এমন যোগ্যতর কোনো গবেষককে আমি দেখতে পাচ্ছি না চারপাশে, যে নিজেকে তৈরি করতে পেরেছে। যে হুট করে একটা গান গেয়ে দিতে পারে। যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে, খেতে পারে, তাদের সঙ্গে এক শয্যায় শুতে পারে। সেই জীবনটাকেই যদি আমরা না পাই, তাহলে কীসের আঞ্চলিক ইতিহাস?

সুধীরকুমার মিত্র স্মারক বক্তৃতা। স্থান : অবনীন্দ্র সভাগৃহ, ৪ জানুয়ারি, ২০১৪।